পলাতকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বি শ্ব ভা র তী
কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম ছত্রের সূচী

পলাতকা

পলাতকা

ঐ যেখানে শিরীষ গাছে
ঝুরু-ঝুরু কচি পাতার নাচে
ঘাসের 'পরে ছায়াখানি কাঁপায় থরথর
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—
ঐখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন-মনে
হেনা-বেড়ার কোণে
শীতের রোদে সারা সকাল বেলা।
তারই সঙ্গে করত খেলা
পাহাড়-থেকে-আনা
ঘনরাঙা-রোঁয়ায়-ঢাকা একটি কুকুর-ছানা।
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে
মিলেছে এক পাঠশালাতে, এক সাথে তাই বেড়ায় হেসে-খেলে।
হাটের দিনে পথের কত লোকে
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেখত অবাক চোখে।

ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন-হাওয়া,
শিউরে ওঠে আকাশ যেন কোন্‌-প্রেমিকের-রঙিন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হল শুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন দুরুদুরু।

হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি।
তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে;
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চমকে দাঁড়ায় বেঁকে।

একদা এক বিকাল বেলায়
আমলকীবন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে—
সম্মুখে তার জীবন মরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

ভেবেছিলেম, আঁধার হলে পরে
ফিরবে ঘরে

চেনা হাতের আদর পাবার তরে।
কুকুর-ছানা বারে বারে এসে
কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে
কেঁদে কেঁদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে জনে,
'কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে?'
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাথি।
আঁধার হল, জ্বলল ঘরে বাতি;
উঠল তারা; মাঠে মাঠে নামল নীরব রাতি।
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে—
'নাই সে কেন, যায় কেন সে, কাহার তরে?'

কেন যে তা সে'ই কি জানে? গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে।
আকাশ হতে, আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
দিশাহারা দখিন-হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এল!
বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহু যুগের ফাগুন-দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অন্বেষণ

জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চলচপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক তারে রাখল না আর বেঁধে।

চিরদিনের দাগ।

ও পার হতে এ পার -পানে খেয়ানৌকো বেয়ে
ভাগ্য-নেয়ে
দলে দলে আনছে ছেলে মেয়ে।
সবাই সমান তারা
এক সাজিতে ভ'রে আনা চাঁপা ফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে!
তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনীজাল বোনা—
দুঃখে সুখে দিন মুহূর্ত গোনা।

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মালো তার বাপের ঘরে,
জননী তার লজ্জা পেল ; ভাবল কোথা থেকে
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইছে যখন চাষি
নামল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল শুরু ;
পদে পদে অপরাধের বোঝা হল গুরু।

কারণ বিনা যে অনাদর আপ্‌নি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় 'পোড়ারমুখি', শাসন করে বাপ—
এ কোন্‌ অভিশাপ
হতভাগী আনলি বয়ে— শুধু কেবল বেঁচে থাকার পাপ!
যতই তারা দিত ওরে গালি
নির্মলারে দেখত মলিন মাখিয়ে তারে আপন কথার কালী।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিনু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
'দাদা' ব'লে
গলা আমার জড়িয়ে ধ'রে বসত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমায় বলত হাসি হাসি—
'আমার নাম যে দুষ্টু, সর্বনাশী!'
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধ'রে
'আমি কে তোর বল দেখি, ভাই, মোরে'
বলত, 'দাদা, তুই যে আমার বর!'—
এমনি করে হাসাহাসি হ'ত পরস্পর।

বিয়ের বয়স হল, তবু কোনোমতে হয় না বিয়ে তার—

তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্মা থেকে পাত্র গেল জুটি।
অল্পদিনের ছুটি ;
শুভকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বলতে গেলেম হেসে
'বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে, ভাই, বরণ করলি শেষে ?'
অমনি যে তার দু চোখ গেল ভেসে
ঝর্‌ঝরিয়ে চোখের জলে। আমি বলি, 'ছি ছি,
কেন শৈল, কাঁদিস মিছিমিছি—
করিস অমঙ্গল !'
বলতে গিয়ে চক্ষে আমার রাখতে নারি জল।

বাজল বিয়ের বাঁশি,
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল দুষ্টু সর্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, 'দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ—
তিন-সত্যি— যেয়ো যেয়ো !' 'যাব, যাব, যাব বৈকি বোন !'
আর কিছু না ব'লে
আশীর্বাদের মোতির মালা পরিয়ে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে
খবর এল, ইরাবতীর সাগর-মোহানাতে

ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে।
আবার ভাগ্য-নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন্ পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে!
কেন এল, কেনই গেল, কেই বা তাহা জানে!
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে।
যাব, যাব, যাব দিদি, অধিক দেরি নাই—
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে কথা কি ভুলতে পারি ভাই?

আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বুকের ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে সেই কথা—

দিনের পরে দিন চলে যায়, ওদের বাড়ি যাই নে আমি আর,
নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার
আপন-মনে
থাকি আপন কোণে—
হেনকালে একদা মোর ঘরে
সন্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে।
বললে, 'খুড়ো, একটা কথা আছে,
বলি তোমার কাছে।

শৈল যখন ছোটো ছিল একদা মোর বাক্স খুলে দেখি,
হিসাব-লেখা খাতার 'পরে একি
হিজিবিজি কালীর আঁচড় ! মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ।
বোঝা গেল শৈলরই এই কাজ।
মারা-ধরা গালি-মন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল—
হঠাৎ তখন মনে এল শাস্তির কৌশল।
মানা ক'রে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে।
সবার চেয়ে কঠিন দণ্ড ! চুপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিণী বিষম ক্রোধে। অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিনি গর্ব ভেঙে বললে এসে : আমি
আর কখনো করব না দুষ্টামি।
আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই কখানা পাতা,
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো !
হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত—
সে শাস্তি নেই, সে দুষ্ট নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগা
শিশু-হাতের আঁচড় ক'টি আমার বুকে লাগা !'

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক-নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো
শিওরের ঐ জানলা দুটো— গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা সেই যেন এক রোগ—
কতরকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ ;
একটু মাত্র অসাবধানেই বিষম কর্মভোগ।
'এইটে ভালো ওইটে মন্দ' যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে—
তাই তো ঘরে পরে
সবাই আমায় বললে, 'লক্ষ্মী সতী
ভালোমানুষ অতি !'

এ সংসারে এসেছিলেম ন বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে

দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।
সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা!
এই জীবনটা ভালো কিম্বা মন্দ কিম্বা যা-হোক-একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু!
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি—
রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে, সেই চাকাটা ঐ-যে থামল যেন
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন?

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে-বিভোল দক্ষিণবায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল—

হেঁকেছিল 'খোল্ রে দুয়ার খোল্'।
সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।
হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া ; হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত ; হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা ; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায়
পাড়ায় কোথায় শতরঞ্জ-খেলায়।
থাক্ সে কথা।
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা!

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।

বাইশ বছর ধ'রে
মনে ছিল, বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে ;
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী ব'লে করে আমার খ্যাতি ;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা !
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।
জনম মরণ এক হয়েছে ঐ-যে অকূল বিরাট মোহানায়
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্।
মরণ-বাসর ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।

চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ-যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো ;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর-দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, 'হাওয়া বদল করো।'
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি।

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে ;
মিলন ছিল ছাড়া-ছাড়া—
চাপা-হাসি টুকরো-কথার নানান জোড়াতাড়া।
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশ-ভরা সকল আলো ধ'রে
বর-বধূরে নিলে বরণ করে।
রোগা মুখের মস্ত বড়ো ঢুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে।

রেল-লাইনের ও পার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে

বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা শিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারই ভার বইবে কেমন ক'রে!
সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগছে বারে-বার,
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার;
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাসুর সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে—
সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি;
তাড়াতাড়ি
নামতে হ'ল; ছ ঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রীশালায়
মনে হল, এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, 'কেন, এই তো বেশ।'
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।

পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।
যাত্রীশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,
'দেখো, দেখো, একাগাড়ি কেমন চলে!
আর দেখেছ? বাছুরটি ঐ, আ ম'রে যাই, চিকন নধর দেহ—
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ!
ঐ যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি—
সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচিল-ঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ঐ-যে রেলের কাছে—
ইস্টেশনের বাবু থাকে? আহা, ওরা কেমন সুখে আছে!'

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে;
বলে দিলেম, 'বিনু, এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।'
প্লাট্‌ফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, 'কথা একটা আছে।'
ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।

বিনু বললে, 'রুক্‌মিণী ওর নাম।
ঐ-যে হোথায় কুয়োর ধারে সার-বাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।
তেরো-শো কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল; স্বামী স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে
কী-এক নদীর ধারে'—
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
'রুক্‌মিণীর এই জীবন-চরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে
আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।'
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিনু বললে খেপে—
'কখ্‌খনো না, বলব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাব্‌না কিসের তবে?
আগাগোড়া সবটা শুনতে হবে।'
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে।
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।

আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামি
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই

পৈঁচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই ;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি ;
সে ভাবনাটা ভারী
রুক্মিণীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার 'পরে ভার
কুলি-নারীর ভাব্না ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

অবাক কাণ্ড এ কী !
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি !
জাতে হয়তো মেথর হবে কিম্বা নেহাত ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে !
এমন হলে দেউলে হতে ক দিন বাকি থাকে !
'আচ্ছা আচ্ছা, হবে হবে। আমি দেখছি, মোট
একশো টাকার আছে একটা নোট,
সেটা আবার ভাঙানো নেই !'
বিনু বললে, 'এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।'
'আচ্ছা, দেব তবে'

এই ব'লে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে ;
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে—
'কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি !
কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধ'রে
দু টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু মাস যেই ফুরালো।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, 'এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্যসিঁদুর-সম !
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে,
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।'

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি

সেই দু মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি—
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্‌মিণীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।
বিন্নু যে সেই দু-মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে—
জানল না তো, ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারই হাতে

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে,
'রুক্‌মিণী সে কোথায় আছে?'
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে—
রুক্‌মিণী কে তাই-বা কজন জানে!
অনেক ভেবে 'ঝামরু কুলির বউ' বললেম যেই
বললে সবে, 'এখন তারা এখানে কেউ নেই।'

শুধাই আমি, 'কোথায় পাব তাকে?'
ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, 'সে খবর কে রাখে?'
টিকিটবাবু বললে হেসে, 'তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিম্বা খসরুবাগে,
কিম্বা আরাকানে।'
শুধাই যত 'ঠিকানা তার কেউ কি জানে'—
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ!
কেমন ক'রে বোঝাই আমি— ওগো, আমার আজ

ফাঁকি

সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন ;
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
'এই ছুটি মাস সুধায় দিলে ভরে'
বিন্নুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন ক'রে !
রয়ে গেলেম দায়ী,
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী !

মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা-সাতটা গাড়ি ;
ছিল কুকুর, ছিল বেড়াল, নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ-সাত জোড়া ;
দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে ছিল চাকর দাসী ;
ছিল সহিস বেহারা চাপরাশি।—
আর ছিল এক মাসি।

স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে
বালক দুটি ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপ্‌নারে
মুছবে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউ-বা ব'লে ওঠে 'আপদ জুটল কোথা থেকে'—

আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে—
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।
শিশুচিত্ত-উৎস-ধারা বন্ধ করে দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে 'চুপ চুপ'
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা;
তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা;
খুশি হলে রাখবে চাপি,
কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি!
অপূর্ব আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সি;
তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হত পদে পদেই দোষী।
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড়,
এরা যদি উল্টে দিত চড়
থাকত নাকো গণ্ডগোলের সীমা—
উভয় পক্ষেরই মা
কানাই বলাই দোঁহার 'পরে পড়ত ঝড়ের মতো,

বিষম কাণ্ড হত
ডাইনে বাঁয়ে দু ধার থেকে মারের পরে মেরে।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ ক'রে মাসি
থাকত উপবাসী ;
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি।

অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলা-ফেরা ওঠা-বসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখিহারা পক্ষীনীড়ের প্রায়।
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি ;
ঘুচে গেল ন্যায়-বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।
সকল দুঃখ দুটি ভাইয়ে করল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্বাক্।
চক্ষে আঁধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয়, তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত 'ক্ষুধা নাই'।
অসুখ করলে দিত চাপা। দেব্‌তা মানুষ কারে

একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।
প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেল এরা
ক্লাসে সবার সেরা,
অপূর্ব আর পূর্ণ এল শূন্য হাতে বাড়ি।
প্রমাদ গণি দীর্ঘনিশাস ছাড়ি
মা ডেকে কয় কানাই-বলাইয়েরে,
'ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে
তোদের প্রাইজ দুটি।
তার পরে যা ছুটি
খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে।
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে।'
এই ব'লে মা নিয়ে ঘরের কোণে
দুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।

এমনি করে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন ক'রে দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
এই জীবনের ভার
যত হাল্কা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার।
সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান—
আগুন তারই শিখার সমান

জ্বলছে এদের প্রাণ-প্রদীপের মুখে।
সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্য-পানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই
কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই।
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে,
করল চুরি পান্নামোতির হার—
থিয়েটারের শখ চেপেছে তার।
পুলিস-ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে
যখন ধরা পড়ে-পড়ে
অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে।
যখন বাহির হল শেষে
সবাই বললে এসে—
'তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা!

ছেলেমানুষ, দোষ কি ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।'

কানাই বলাই জ্ব'লে ওঠে প্রলয়বহ্নিপ্রায়,
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।
মা বললেন, 'আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরই অপমান।'
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি ;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস, বেহারা চাপরাসি।

অপমানের তীব্র আলোক জ্বেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চ'লে চ'লে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।
মনের মতো বউ এসেছে, একটি দুটি আসছে নাৎনি নাতি—
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথি।
মা বললেন, 'মিটবে এবার চিরদিনের আশ—
মরার আগে করব কাশীবাস।'
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পুজোর ছুটির দিনে

মনের মতো বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছর-খানেক না পেরতেই শ্রাবণ মাসের শেষে
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক্ সবাই ; মা বললেন, 'তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বুদ্ধি হল, অপূর্বকে পুরতে দিবি জেলে ?'
কানাই বললে, 'তোমার ছেলে ব'লেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের 'পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।'

মা বললেন, 'ভুলবি কেন ? মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তা হলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর-কাহারও 'পরে
বাইরে কিম্বা ঘরে ?
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে
তখন আমার মনে হল, আমি যদি স্বপ্নমাত্র হই,
জেগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছুই নই—

তা হলে হয় ভালো।
মনে হল, শত্রু আমার আকাশ-ভরা আলো,
দেব্‌তা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা,
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা!
তাই তো বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায় না যেন কোনো জনা,
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।'

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে,
ব'লে রাখি সে কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ ক'রে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
তবিল-ভাঙার জাল হিসাবের দায়ে ঠেকেছে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি, তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বললে, 'মনে কি নেই?' অপূর্ব কয় নতমুখে,—
'অনেক দিন সে গেছে চুকেবুকে।'
'চুকে গেছে!' কানাই উঠল বিষম রাগে জ্ব'লে,—

'এত দিনের পরে যেন আশা হচ্ছে চুকে যাবে ব'লে।'

নীচের তলায় বলাই আপিস করে ;

অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারই ঘরে।

বললে, 'আমায় রক্ষা করো।'

বলাই কেঁপে উঠল থরোথরো।

অধিক কথা কয় না সে যে ; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দরোয়ানে।

অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে।

অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে ;

এদের ঘরে নিজে

আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।

অনেক রকম ক'রে ইতস্তত

পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।

পূর্ণ বললে, 'রক্ষা করো মাসি।'

এরই পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে

কানাই তারে বললে ধীরে ধীরে—

'জান তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য,

এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য।

বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,

উচিত নয় মা, সেটা কারো পক্ষে।'

কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে

অপ্রসন্নমুখে।
বললে, 'হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে,
দেখব তখন বিবেচনা ক'রে।'
মা বললেন, 'তোরা বলিস কী এ!
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে
আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম!
এই কি তোদের ধর্ম!'
এত বলি বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি।
তারা বলে, 'যাচ্ছ কোথায়?' মা বললেন, 'অপূর্বদের বাড়ি।
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে,
রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে।'
'রোসো রোসো, থামো থামো, করছ এ কী
আচ্ছা, ভেবে দেখি।
তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা নাহয় যা বলছ তাই হবে।'

আর কি থামেন তিনি?
গেলেন একাকিনী
অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি।
ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপরাসি;
প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী।

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, ‘মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরই সঙ্গে বিয়ে দেবে ?— বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো ;
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড়।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো।’
বাপ বললে, ‘কান্না তোমার রাখো।
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে !
সমাজে তো উঠতে হবে, সেটা কি কেউ ভাবো ?
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব ?’
মা বললে, ‘কেন, ঐ-যে চাটুজ্জেদের পুলিন,
নাই-বা হল কুলীন—
দেখতে যেমন তেমনি স্বভাবখানি,
পাস ক’রে ফের পেয়েছে জলপানি—
সোনার টুকরো ছেলে।
এক পাড়াতে থাকে ওরা, ওরই সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হল ; ওকে যদি বলি আমি আজই
এখ্‌খনি হয় রাজি।’
বাপ বললে, ‘থামো,
আরে আরে, রামোঃ !
ওরা আছে সমাজের সব-তলায়।

বামুন কি হয় পইতে দিলেই গলায় !
দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল ! রাধে !
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে !'

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে ক'নের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা ;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতি ক্ষণে হানছে যেন বেদনাবিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতি ক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চি-খানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।
তিনি বলেন তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য—
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ ব'লে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি,
'হও তুমি সাবিত্রীর মতো, এই কামনা করি।'

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু মাস যেতেই ফলল কেমন করে,
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে—
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো।
অবশেষে হল
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন শিশুকালে
হৃদয়লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি

প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি ;
জানত না তো আপ্‌নাকে সে,
শুধায় নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খেপা বাতাস এসে ;
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে ।
সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপড়ি-ভারে আপনি সমাকুল।
আপ্‌নাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি,
তাই তো থাকি থাকি
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশ-পারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝর্না বেয়ে ;
রাতের অন্ধকারে
কোন্‌-অসীমের-রোদন-ভরা বেদন লাগে তারে !
বাহির হতে তার
ঘুচে গেছে সকল অলংকার,
অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে—
তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে :
কখন কাজের ফাঁকে
জানলা ধ'রে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ঐ সজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবস-রাতি !
যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথি
আজ সে কেমন করে

জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে।
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।
পায়ের শব্দ তারই
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারই করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুন্‌গুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জল-ভরা এক ছায়া ;
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, 'হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাকো !'

একদা বাপ দুপুর বেলায় ভোজন সাঙ্গ করে
গুড়্গুড়িটার নলটা মুখে ধরে
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,

পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বললেন, বাতাস ক'রে গায়ে,
কখনো-বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
'যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্ব'রে,
আমি কিন্তু পারি যেমন ক'রে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।'
বাপ বললেন কঠিন হেসে, 'তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে কোরো আমার মরার পরে ;
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।'
এই ব'লে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বললেন, 'উঃ, কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে!'
বাপ বললেন, 'আমি পাষাণ বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পুতুল হলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গ'লে।'
মা বললেন, 'হায় রে কপাল! বোঝাবই বা কারে?
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ওই মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ—
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।'
বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, 'মেয়েমানুষ

হৃদয়তাপের-ভাপে-ভরা ফানুষ।
জীবন একটা কঠিন সাধন, নেই সে ওদের জ্ঞান।'
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান

দুখের তাপে জ্ব'লে জ্ব'লে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবা-ভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা ;
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি—
সকাল বেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যা বেলায় রুটি কিম্বা লুচি,

ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা ;
পাঁঠা হত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দু বেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে ;
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে।
গয়লানি আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নালিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদে-পদেই ঘটে যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হয়ে নীরব নত,
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন ক'রে মাতা বারম্বার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার

হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেমনি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান্
সেই কথাটি মনে করে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ—
'আমার মায়ের যত্ন যে জন পেয়েছে একবার
আর-কিছু কি পছন্দ হয় তার!'

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারী।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারে বারেই আসতে যেতে হয়।
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো!
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনোদিন!
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ!

চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন !
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে !

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁটের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে
চুপ করে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগীসেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—
'জানো তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে !
সে ইচ্ছাটি তাঁরই
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি ?'

'না না,- ছিছি, ছিছি !'

এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা তু হাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে

ছুটে গেল ঘরের থেকে।

আপন ঘরে তুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—

ঝর্‌ঝরিয়ে ঝর্‌ঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।

ভাবলে, 'পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ওঁর চোখ।

আর কেন গো ? এবার মরণ হোক।'

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুণ করে

অষ্টপ্রহর ধরে।

আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে ;

যে বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে।

তু-তিন ঘণ্টা পর

একবার যে ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।

কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,

ঠিক ছিল না তাহার।

কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়

শ্রান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের 'পরে লোটায়।

যে দেখল সেই অবাক হয়ে রইল চেয়ে ;

বললে, 'ধন্যি মেয়ে !'

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, 'গর্ব করি নেকো—

কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।

ব্রহ্মচর্যব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর। নইলে দেখতে অন্যরকম হ'ত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরই কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ ;
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।'

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে
গুজব গেল শোনা,
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয় নিকো বিশ্বাস ;
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব—
আসছে ঘরে নানারকম বিলিতি আসবাব।
দেখলে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা শুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকা চুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুক-ভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।

হোক-না মৃত্যু, তবু
এ বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা ;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরই পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জা ভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে—
'তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে !
আমরা তোমার ছেলে মেয়ে নাৎনি নাতি যত
সবার মাথা করবে নত ?
মায়ের কথা ভুলবে তবে ?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে !'

বাবা বললে শুষ্ক হাসে—
'কঠিন আমি কেই বা জানে না সে !
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম

স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে, দুঃখ দিতে,
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে ?'

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের ক' দিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি প'ড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চ'লে
সেইখানেতেই ঘর পাতবে ব'লে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

মালা

আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে,
সিংহাসনে রানীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারই 'পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা।

কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুমুখী জনধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।
যারে শুধাই 'কোথায় যাবে' সেই তখনি বলে,
'রানীর সভাতলে।'
যারে শুধায় 'কেন যাবে' কয় সে তেজে, চক্ষে দীপ্ত জ্বালা—
'নেব বিজয়মালা।'

কেউ বা ঘোড়ায় কেউ বা রথে
ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে।

মনে যেন আগুন উঠল খেপে,
চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।
মনে মনে কইনু হর্ষে, 'ওগো জ্যোতির্ময়ী,
তোমার সভায় হব আমি জয়ী।

মালা

শূন্য ক'রে থালা
নেব বিজয়মালা

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মুখ,
প্রভাত-তারার মতো যে তার নয়ন-দুটি কী লাগি উৎসুক!
সবাই যখন ছুটে চলে
সে যে তরুর তলে
আপন-মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শুধায় তাকে,
যার কথা সে ভাবে কী তার নাম!
আমি তারে যখন শুধালাম
'মালার আশায় যাও বুঝি ঐ হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা'
সে বলে, 'ভাই, চাই নে বিজয়মালা।'

তারে দেখে সবাই হাসে;
মনে ভাবে, 'এও কেন মোদের সাথে আসে—
আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে!'
সবার তরে জায়গা সে দেয় মেলে,
আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে;
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে

হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা ;
তবু বলে, চায় না বিজয়মালা।

সিংহাসনে একলা বসে রানী
মূর্তিমতী বাণী।
ঝংকারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে
আমার বীণা বাজে।
কখনো বা দীপকরাগে
চমক লাগে,
তারা বৃষ্টি করে ;
কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।
আর-সকলে গান শুনিয়ে নতশিরে
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে
গেছে ঘরে ফিরে।
তারা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা
আমি পাব রানীর বিজয়মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথি বসে থাকে ধুলায় আসন-তলে ;
কথাটি না বলে
দৈবে যদি একটি-আধটি চাঁপার কলি
পড়ে স্খলি

রানীর আঁচল হতে মাটির 'পরে,
সবার অগোচরে
সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
পরে কর্ণমূলে।
সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে
যদি তারে বলি হেসে
'প্রদীপ জ্বালার সময় হল সাঁঝে,
এখনো কি রইবে সভা-মাঝে?'
সে হেসে কয়, 'সব সময়েই আমার পালা—
আমি যে ভাই, চাই নে বিজয়মালা।'

আষাঢ় শ্রাবণ অবশেষে
গেল ভেসে
ছিন্ন মেঘের পালে—
গুরু গুরু মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে।
শরৎ এল, শরৎ গেল চলে;
নীল আকাশের কোলে
রৌদ্রজলের কান্নাহাসি হল সারা;
আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফুলের ঝারা।
ফাগুন চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর,
দখিন-হাওয়ার আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর।
কণ্ঠে আমার একে একে সকল ঋতুর গান

হল অবসান।
তখন রানী আসন হতে উঠে
আমার করপুটে
তুলে দিলেন শূন্য করে থালা
আপন বিজয়মালা।

পথে যখন বাহির হলেম মালা মাথায় প'রে
মনে হল, বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণিধুলার মতো।
মানুষ শত শত
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউ বা কৌতূহলে,
কেউ বা স্তুতিচ্ছলে,
কেউ বা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়!
হায় রে হায়,
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।
এই ধরণীর লাজুক যত সুখ
ছোটোখাটো আনন্দেরই সরল হাসিটুক
নদীচরের ভীরু হংসদলের মতো
কোথায় হল গত!
আমি মনে মনে ভাবি, 'একি দহনজ্বালা
আমার বিজয়মালা!'

ওগো রানী, তোমার হাতে আর-কিছু কি নেই ?
শুধু কেবল বিজয়মালা এই ?
জীবন আমার জুড়ায় না যে ;
বক্ষে বাজে
তোমার মালার ভার—
এই কি পুরস্কার ?
এ তো কেবল বাইরে আমার গলায় মাথায় পরি ;
কী দিয়ে যে হৃদয় ভরি
সেই তো খুঁজে মরি।
তৃষ্ণা আমার বাড়ে শুধু মালার তাপে ;
কিসের শাপে
ওগো রানী, শূন্য ক'রে তোমার সোনার থালা
পেলেম বিজয়মালা ?

আমার কেমন মনে হল, আরো যেন অনেক আছে বাকি—
সে নইলে সব ফাঁকি
এ শুধু আধখানা—
কোন্ মানিকের অভাব আছে, এ মালা তাই কানা।
হয় নি পাওয়া, সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
এমন করে বাজে !
চল্ রে ফিরে, বিড়ম্বিত, আবার ফিরে চল্,
দেখবি খুঁজে বিজন সভাতল—

যদি রে তোর ভাগ্যদোষে
ধুলায় কিছু পড়ে থাকে খসে।
যদি সোনার থালা
লুকিয়ে রাখে আর-কোনো এক মালা!

সন্ধ্যাকাশে শান্ত তখন হাওয়া;
দেখি, সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া পাওয়া
নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠেলি,
তরুশ্রেণী স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি।
বিজন পথে আঁধার গগনতলে
আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন জ্বলে?
আকাশের ঐ তারার কাছে
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে।
দিনের আলোয় ভুলিয়েছিল মুগ্ধ আঁখি,
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি।
এরই লাগি এত বিবাদ? সারা দিনের এত দুখের পালা?
লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা!

ঘনিয়ে এল রাতি।
হঠাৎ দেখি, তারার আলোয় সেই-যে আমার পথের তরুণ সাথি
আপন-মনে
গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে।

আমি তারে শুধাই ধীরে, 'কোথায় তুমি এই নিভৃতের মাঝে
রয়েছ কোন্ কাজে ?'
সে হেসে কয়, 'ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তখন রানীর আসন পড়ে বকুল-বীথিকাতে—
আমি একা বীণা বাজাই রাতে।'
শুধাই তারে, 'কী পেলে তাঁর কাছে ?'
সে কয় শুনে 'এই-যে আমার বুকের মাঝে আলো ক'রে আছে—
কেউ দেখে নি রানীর কোলে পদ্মপাতার ডালা,
তারই মধ্যে গোপন ছিল আপন হাতের গাঁথা বরণমালা।'

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে—
থামল তাহার হাস্য-উছল বাণী,
থামল তাহার নৃত্যনূপুর-ঝর্‌ঝরানি,
সূর্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল এক নিমেষে,
বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।
মনে হল, আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে
ঘুম-ভাঙনের সাগর-মাঝে আর কি তুফান তোলে!
ছুটোছুটির উপদ্রবে
ব্যস্ত হত সবে,
হাঁ-হাঁ ক'রে ছুটে আসত 'আরে আরে করিস কী তুই' ব'লে;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠত যেন টলে।
আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁক ডাক,
চাক-ভরা মৌমাছির মতো উড়ে গেছে শূন্য করে চাক।

আমার এ সংসারে
অত্যাচারের সুধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ;
তাই এ ঘরের প্রাণ
লোটায় ম্রিয়মাণ
জল-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধু, 'কেন, নাই সে কেন ?'

সবাই তারে দুষ্টু বলত, ধরত আমার দোষ ;
মনে করত, শাসন বিনা বড়ো হলে ঘটাবে আপশোষ।
সমুদ্র ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জে ছুটে
ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কূলে কূলে দুলে দুলে পড়ে লুটে লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তার দুষ্টুমিটি তেমনি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার ক'রে
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভ'রে।
বয়সের এই পর্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চিরবালক লুকিয়ে খেলা করে,
বিজুর হাতে পেলে নাড়া
সেই-যে দিত সাড়া।
সমান বয়স ছিল আমার কোন্‌খানে তার সনে,
সেইখানে তার সাথি ছিলেম সকল প্রাণে মনে !
আমার বক্ষ সেইখানে একতালে

উঠত বেজে তারই খেলার অশান্ত গোলমালে।
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।
পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে গাছের ডালে
দুপুর বেলায় খেয়েছি আম করে কাড়াকাড়ি—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে 'বিষম বাড়াবাড়ি'।
বারে বারে
আমার লেখার ব্যঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বলত তারে,
'দেখিস নে তোর বাবা আছেন কাজে?'
বিজু তখন লাজে
বাইরে চলে যেত। আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায়;
মনে হত, 'টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়?'

ভোর না হতে রাতি
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথি,
মনে হল এতদিনে বুড়ো-বয়সখানা
পুরল ষোলো আনা।
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে

লক্ষ্য ক'রে বৈতরণীর ঘাট ;
গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন ক'রে প্রাণটা হবে কাঠ ;
সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে,
দৌড়বে মন লেখার খাতার শুকনো পাতে পাতে ;
বৈঠকেতে চলবে আলোচনা
কেবলই সৎপরামর্শ, কেবলই সদ্‌বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে
দারুণ শূন্য রয়েছে মোর চৌকি টেবিল চেপে।
তাই সেখানে টিকতে নাহি পারি ;
বৈরাগ্যে মন ভারী,
উঠোনেতে করছিনু পায়চারি।
এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে—
হঠাৎ কে এক ঝড়ের মতো বুকের 'পরে পড়ল আমার ঝেঁপে।
চমক লাগল শিরে শিরে,
হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে !
আমি শুধাই, 'কে রে ! কী রে !'
'আমি ভোলা' সে শুধু এই কয়,
এই যেন তার সকল পরিচয়—
আর কিছু নেই বাকি।
আমি তখন অচেনারে দু হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি।
সে বললে, 'ঐ বাইরে তেঁতুল গাছে

ঘুড়ি আমার আটকে আছে,
ছাড়িয়ে দাও-না এসে।'
এই ব'লে সে
হাত ধ'রে মোর চলল নিয়ে টেনে

ওরে ওরে, এইমত যার হাজার হুকুম মেনে
কেটেছিল ন'টা বছর, তারই হুকুম আজও মর্ত্যতলে
ঘুরে বেড়ায় তেমনি নানান ছলে!
ওরে ওরে, বুঝে নিলেম আজ,
ফুরোয় নি মোর কাজ।
আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা আজও
কত সাজেই সাজো!
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে।

আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল ন'ড়ে,
আবার হঠাৎ উল্টে প'ড়ে
দোয়াত হল খালি,
খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কালী।
আবার কুড়াই ঝিনুক শামুক নুড়ি,
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁড়ি।

ভোলা

আবার আমার নষ্ট সময় ভ্রষ্ট কাজে
উলট-পালট গণ্ডগোলের মাঝে
ফেলাছড়া ভাঙাচোরার পর
আমার প্রাণের চিরবালক নতুন ক'রে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা।

ছিন্ন পত্র

কর্ম যখন দেব্‌তা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণপ্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে ;
তারই মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে—
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা,
পায় না কোনো রস—
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্‌ মোহের পাকে
মরণ-দশা ঘটেছে তার সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে প'ড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে ;
বৃহৎ সর্বনাশে
হারিয়েছিলেম বিশ্বজগৎখানি।
নীল আকাশের সোনার বাণী
সকাল-সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছত না মোর বাতায়ন-দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারই পাতে,
আমার আঙিনাতে
আনত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।

অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কী যে সে ক্রন্দন
জানব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সংগোপনে বহন ক'রে, কর্মরথে
সমারোহে চলতেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।

তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হ'ত নকল সিংহনাদ;
বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা;
রিপোর্ট্ লিখতে হত তক্তা তক্তা;
যুদ্ধ হত সেনেট-সিণ্ডিকেটে;
তার উপরে আপিস আছে— এমনি ক'রে কেবল খেটে খেটে
দিন রাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বলত, 'করছ কী এ!
মারা যাবে শেষে!'
আমি বলতেম হেসে—
'কী করি ভাই, খাটতে হয় কি সাধে!
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কী করি তার উপায় বলতে পারো?'
বিশ্বকর্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার 'পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সেদিন তখন দু-তিন রাত্রি ধরে
গত-সনের রিপোর্ট্‌খানা লিখেছি খুব জোরে।
বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি,
হপ্তা-তিনেক মরতে হবে ভোট কুড়োতে তারি।
শীতের দিনে যেমন পত্রভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার
আমার হল তেমনি দশা ;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে 'খাবার তৈরি', নিই নে কথা কানে ;
আবার যদি খবর আনে
বলি ক্রোধের ভরে,
'মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া তো থাক্‌ পরে।'

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হল পাড়া,
আর-সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখি ছাড়া,
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্‌ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে,
নাইকো দাঁড়ি কমা—

শেষ লাইনে নাম লেখা তার 'মনোরমা'।
আর হল না পড়া,
মনে হল কোন্ বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া—
চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।

এমনি ক'রে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা-তিনেক গেল ডুবে।
সূর্য ওঠে পশ্চিমে কি পুবে
সেই কথাটাই ভুলে গেছি চলছি এমন চোটে।
এমন সময় ভোটে
আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার করলে অধিকার;
তাহার পরে খালি
কাগজপত্রে চলল গালাগালি।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়ল হাতে,
সেটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছি বসে আরাম-কেদারাতে;
এমন সময় হঠাৎ দখিন-পবন-ভরে
ছেঁড়া চিঠির টুকরো এসে পড়ল আমার কোলের 'পরে।
অন্যমনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়ল চোখে 'মনুরে কি গেছ এখন ভুলে'।

মনু ? আমার মনোরমা ? ছেলেবেলার সেই মনু কি এই ?
অমনি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভ'রে
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে।
সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনি,
পায়ে পায়ে বাজাত মল্ রিনি ঝিনি।
সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা ;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অমনি ওদের বাড়ির পানে ছোটা ;
ওরই সঙ্গে শুরু হত দিনের প্রথম খেলা।
মনে পড়ে, পিঠের 'পরে চুলটি মেলা
সেই আনন্দমূর্তিখানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি।
অসীম ধৈর্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
সকল কথায় মানত মনু হার।
উঠে গাছের আগ্‌ডালেতে দোলা খেতেম জোরে—
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি ক'রে—
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে
ভুলতে পারি কি সে !

মনে পড়ে নীরব ব্যথা তার
বাবার কাছে যখন খেতেম মার ;
ফেলেছে সে কত চোখের জল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজত কত ছল।
আরো কিছু বড়ো হলে
আমার কাছে নিত সে তার বাংলা পড়া ব'লে।
নামতাটা তার কেবল যেত বেধে ;
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে
ভাবত মনে, গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা—
যা-কিছু সব বিষম কঠিন আমার কাছে যেন নেহাত সোজা।

হেন কালে হঠাৎ সে-বার,
দশমীতে দ্বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর-দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মনুর বাবার বাধল মকদ্দমা,
কেউ কাহারে করলে না আর ক্ষমা !
দুয়ার মোদের বন্ধ হল—
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,

হঠাৎ এল কোন্ দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জন,
মোর প্রতিমার হল বিসর্জন।

দেখাশোনা ঘুচল যখন, এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠল ফুটে আঁধার-পটে সন্ধ্যাতারার মতো ;
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে, সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়।
প্রেমের শিখা জ্বলল তখন নিবল যখন চোখের পরিচয়।

কত বছর গেল চলে,
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা-পাস হলে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ি কিনেছে কোন্ পাটের কুঠিয়াল,
হল অনেক কাল।
বিয়ে করে মনুর স্বামী
কোন্ দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।

সেই মনু আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে,
কোন্ কথাটি পাঠালো তার পত্রপুটে ?

কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি? ক্ষতি সে কি? সে কি অত্যাচার?
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে?

ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্ব-মাঝে কোথায় আছে খুঁজে পাব নাকি?
'মনুরে কি গেছ ভুলে'
এ প্রশ্ন কি অনন্তকাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো!
কত চিঠির জবাব লিখব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বলবে বহ্নিশিখা—
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।

কালো মেয়ে

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর ক'রে ক্রমে
বয়স উঠছে জমে।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবসরাত্রি কালো মেয়েটিরে।

সামনে-বাড়ির নীচের তলায় আমি থাকি মেস্'এ ;
বহুকষ্টে শেষে
কলেজেতে পার হয়েছি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন ক'রে এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে !
দুই বেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েছি আধ-পেটা।
ভিক্ষা করা সেটা

সইত না একবারে—
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাত পক্ষে আধা মাইনেয়, ভর্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবি ;
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তি-মাঝে ঢেকে।
আজকে দেখি, নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।
মনে হচ্ছে, ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায় ;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা—
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা !
কোথায় মুক্ত অরণ্যানী, কোথায় মত্ত বাদল মেঘের ভেরা !
এ কী বাঁধন রাখল আমায় ঘেরি !

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোশে শুয়ে পড়ি ধপাস্ ক'রে।
হাত-পাখাটার বাতাস খেতে খেতে

হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে—
মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী।
মনে হয় যে, রোদের পরে বৃষ্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরান জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।
আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা—
ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যাছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথরাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে ;
লাজুক ভীরু ঝর্নাখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি ;
রাত-জাগা এক পাখি
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি ;
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা
ঘনঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

রাখাল ছেলের সঙ্গে ব'সে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে ;
একলা থাকি মেস্'এ।

সকাল-সাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা ছিল মনে।

ঐ-যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরানী—
যেমনতরো ওর ভাঙা ঐ জানলাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা,
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলস-ভরে,
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী,
তেমনি আমার বাঁশের বাঁশি আপন-ভোলা,
চার দিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জানলা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা,
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

আসল

বয়স ছিল আট,
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত, মুখুজ্জেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি পোড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো।
পাড়ার আবর্জনা যত
ঐখানেতেই উঠছে জমে,
এক ধারেতে ক্রমে
পাহাড়-সমান উঁচু হল প্রতিবেশীর রান্নাঘরের ছাই;
গোটা-কয়েক আকন্দ গাছ, আর কোনো গাছ নাই;
দশ-বারোটা শালিখ পাখি
তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি;
দুপুর বেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শূন্যে কিসের কৌতূহলে।

পাড়ার মধ্যে ঐ জমিটাই কোনো কাজের নয়;
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষ্মীছাড়ার তাই ছিল সঞ্চয়;
তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,

আসল

ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন,
মরচে-পড়া টিনের লণ্ঠন,
সিগারেটের শূন্য বাক্স, খোলা চিঠির খাম—
অ-দরকারের মুক্তি হোথায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।

তখন আমার বয়স ছিল আট,
করতে হত ভূবৃত্তান্ত পাঠ।
পড়ার ঘরের দেয়ালে চার পাশে
ম্যাপ্‌গুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পরিহাসে ;
পাহাড়গুলো ম'রে-যাওয়া শুঁয়োপোকার মতো,
নদীগুলো যত
অচল রেখার মিথ্যা কথায় অবাক্ হয়ে রইত থতমত,
সাগরগুলো ফাঁকা,
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আখর-আঁকা।
হাঁপিয়ে উঠত পরান আমার ধরণীর এই শিকল-রেখার রূপে—
আমি চুপে চুপে
মেঝের 'পরে বসে যেতেম ঐ জানলার পাশে।
ঐ যেখানে শুকনো জমি শুকনো শীর্ণ ঘাসে
পড়ে আছে এলোথেলো, তাকিয়ে ওরই পানে
কার সাথে মোর মনের কথা চলত কানে কানে।
ঐ যেখানে ছাইয়ের গাদা আছে
বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে।

মাথার 'পরে উদার নীলাঞ্চল
সোনার আভায় করত ঝলোমল।
সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর সুদূর পারের বাণী
আমার কাছে দিতেন আনি।
ম্যাপের সঙ্গে হত না তার মিল ;
বইয়ের সঙ্গে ঐক্য তাহার ছিল না এক তিল।
তার চেহারা নয় তো অমন মস্ত ফাঁকা ;
আঁচড়-কাটা আখর-আঁকা
নয় সে তো কোন্ মাইল-মাপা বিশ্ব—
অসীম যে তার দৃশ্য আবার অসীম সে অ-দৃশ্য।

এখন আমার বয়স হল ষাট—
গুরুতর কাজের ঝঞ্ঝাট।
পাগল ক'রে দিল পলিটিক্স্‌এ ;
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা স্বপ্ন আজকে নাগাদ হয় নি জানা ঠিক সে—
ইতিহাসের নজির টেনে সোজা
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আর-এক দেশের কর্মফলের বোঝা ;
সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উন্মত্ত।
যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।

কথায় কেবল কথারই ফল ফলে,
পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে পুঁথি কেবলমাত্র পুঁথিই বেড়ে চলে

আজ আমার এই ষাট বছরের বয়স-কালে
পুঁথির সৃষ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে
হাঁপিয়ে উঠলে প্রাণ
পালিয়ে যাবার আছে একটি স্থান—
সেই মহেশের পাশে
পাড়ায় যারে পাগল ব'লে হাসে।
পাছে পাছে
ছেলেগুলো সঙ্গে যে তার লেগেই আছে।
তাদের কলরবে
নানান উপদ্রবে
এক মুহূর্ত পায় না শান্তি,
তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্লান্তি।
বেগার-খাটা কাজ
তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ।
সকাল বেলায় ধরে ভজন গলা ছেড়ে;
যতই সে গায় বেসুর ততই চলে বেড়ে।
তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে এসে
মহেশ বলে হেসে,
'আমার এ গান শোনাই যাঁরে

বেস্থর শুনে হাসেন তিনি, বুক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।
তিনি জানেন, স্থর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,
বেস্থর কেবল পাগলের এই গলায়।'

সকল প্রয়োজনের বাহির সে যে সৃষ্টিছাড়া,
তার ঘরে তাই সকলে পায় সাড়া।
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভুতো ;
একদা কার ঘরের দাওয়ায় ঢুকেছিল অনাহূত—
মারের চোটে জরোজরো
পথের ধারে পড়ে ছিল মরোমরো ;
খোঁড়া কুকুরটারে
বাঁচিয়ে তুলে রাখলে মহেশ আপন ঘরের দ্বারে।
আর-একটি তার পোষ্য ছিল, ডাক-নাম তার সুর্মি,
কেউ জানে না জাত যে কী তার, মুসলমান কি কাহার কিম্বা কুর্মি।
সে বছরে প্রয়াগেতে কুম্ভমেলায় নেয়ে
ফিরে আসতে পথে দেখে, চার বছরের মেয়ে
কেঁদে বেড়ায় বেলা তুপুর ছুটোয়।
মা নাকি তার ওলাউঠোয়
মরেছে সেই সকাল বেলায়।
মেয়েটি তাই বিষম ভিড়ের ঠেলায়
পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছিল ভয়েই ভেবাচেকা—
মহেশকে যেই দেখা

কী ভেবে যে হাত বাড়ালো জানি না কোন্ ভুলে।
অমনি পাগল নিল তারে কাঁধের 'পরে তুলে,
ভোলানাথের জটায় যেন ধুৎরোফুলের কুঁড়ি।
সে অবধি তার ঘরের কোণটি জুড়ি
সুর্মি আছে ঐ পাগলের পাগলামির এক স্বচ্ছ শীতল ধারা,
হিমালয়ে নির্ঝরিণীর পারা।
এখন তাহার বয়স হবে দশ,
খেতে শুতে অষ্টপ্রহর মহেশ তারই বশ।
আছে পাগল ঐ মেয়েটির খেলার পুতুল হয়ে
যত্নসেবার অত্যাচারটা সয়ে।
সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার থেকে ফিরে
যেমনি মহেশ ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীরে ধীরে,
পথ-হারানো মেয়ের বুকে আজও যেন জাগায় ব্যাকুলতা—
বুকের 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গলা ধ'রে আবোল-তাবোল কথা।

এই আদরের প্রথম বানের টান
হলে অবসান
ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে।
সামান্য কোন্ কথা হত এই পাগলের সাথে।
নাইকো পুঁথি, নাইকো ছবি, নাই কোনো আসবাব ;
চিরকালের মানুষ যিনি ঐ ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।
তারার মতো আপন আলো নিয়ে বুকের তলে

যে মানুষটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মতো সীমাহীনের হাতে
সরল সুরে বাজে দিনে রাতে,
যাঁর চরণের স্পর্শে
ধুলায় ধুলায় বসুন্ধরা উঠল কেঁপে হর্ষে—
আমি যেন দেখতে পেতেম তাঁরে
দীনের বাসায় এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।
রাজনীতি আর সমাজনীতি, পুঁথির যত বুলি,
যেতেম সবই ভুলি।
ভুলে যেতেম রাজার কারা মস্ত বড়ো প্রতিনিধি
বালুর 'পরে রেখার মতো গড়ছে রাজ্য, লিখছে বিধান বিধি।

ঠাকুরদাদার ছুটি

তোমার ছুটি নীল আকাশে,
তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থইহারা ঐ
দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুল-তলায়,
গোলাবাড়ির কোণে,
তোমার ছুটি ঝোপে-ঝাপে
পারুলডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আশা কাঁপে
কাঁচা ধানের খেতে,
তোমার ছুটির খুশি নাচে
নদীর তরঙ্গেতে।

আমি তোমার চশমা-পরা
বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাজের মাকড়্‌ষাটার
বিষম জালে বাঁধা—

আমার ছুটি সেজে বেড়ায়
তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির
মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারই ঐ
চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই
আমার ছুটি আছে।

তোমার ছুটির খেয়া বেয়ে
শরৎ এল মাঝি।
শিউলিকানন সাজায় তোমার
শুভ্র ছুটির সাজি।
শিশির-হাওয়া শির্‌শিরিয়ে
কখন্‌ রাতারাতি
হিমালয়ের থেকে আসে
তোমার ছুটির সাথি।
আশ্বিনের এই আলো এল
ফুল-ফোটানো ভোরে
তোমার ছুটির রঙে রঙিন
চাদরখানি 'পরে।

আমার ঘরে ছুটির বন্যা
তোমার লাফে ঝাঁপে,
কাজকর্ম হিসাব-কিতাব
থর্‌থরিয়ে কাঁপে।
গলা আমার জড়িয়ে ধর,
ঝাঁপিয়ে পড় কোলে,
সেই তো আমার অসীম ছুটি
প্রাণের তুফান তোলে
তোমার ছুটি কে যে জোগায়
জানি নে তার রীত,
আমার ছুটি জোগাও তুমি
ঐখানে মোর জিত।

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানি।

আমি ছিলাম ছাতে
তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, 'কী হয়েছে বামি?'
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, 'হারিয়ে গেছি আমি!'

হারিয়ে-যাওয়া

তারায়-ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশ-পানে চেয়ে,
আমার বামির মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে 'হারিয়ে গেছি আমি'।

শেষ গান

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল শাদা কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা, মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা,
তাদের প্রাণের ঝর্না-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার-ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ু,
নয় সে কেবল দিন-রজনীর সাতনলী হার, নয় সে নিশাস-বায়ু।
নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজন-বন্ধুজনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবন-সুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।
একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
বহু দূরে ; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—
গর্ভবাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শুষ্ক জীবন মম
শীর্ণ রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী-সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত সলিল স্রস্ত অবহেলায়।

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের
আলো—
বলে নে, 'ভাই, এই-যে দেখা এই-যে ছোঁওয়া এই ভালো এই
ভালো!
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই
ভাষায়—
তারার সাথে নিশীথ-রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাণের আশায়!'

শেষ প্রতিষ্ঠা

এই কথা সদা শুনি ‘গেছে চলে’ ‘গেছে চলে’।
তবু রাখি বলে
বোলো না ‘সে নাই’।
সে কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়ে বাজে।

মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে ‘আছে’ ‘নাই’ পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

সাময়িক পত্রে প্রকাশ

১	পলাতকা	প্রবাসী । বৈশাখ ১৩২৫
২	চিরদিনের দাগা	ভারতী । বৈশাখ ১৩২৫
৩	মুক্তি	সবুজ পত্র । বৈশাখ ১৩২৫
৪	ফাঁকি	মানসী ও মর্ম্মবাণী । জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
৫	মায়ের সম্মান	ভারতী । জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
৬	নিষ্কৃতি	প্রবাসী । জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
৭	মালা	প্রবাসী । আষাঢ় ১৩২৫
৮	ভোলা	ভারতী । আষাঢ় ১৩২৫
৯	ছিন্ন পত্র	সবুজ পত্র । জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫
১০	কালো মেয়ে	সবুজ পত্র । আষাঢ় ১৩২৫
১১	আসল	প্রবাসী । শ্রাবণ ১৩২৫
১২	ঠাকুরদাদার ছুটি	পার্ব্বণী । আশ্বিন ১৩২৫
১৩	হারিয়ে-যাওয়া	ভারতী । শ্রাবণ ১৩২৫
১৪	শেষ গান	সবুজ পত্র । জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪
১৫	শেষ প্রতিষ্ঠা	

=সাময়িক পত্রে মুদ্রিত বিশেষ শিরোনাম=

১ নিরুদ্দেশ

৬ যেনাস্মাঃ পিতরো যাতাঃ

১৪ পরমায়ু ॥ গ্রন্থে সংকলন-কালে কিছু কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। অধিকতর পরিবর্তিত একটি পাঠ 'পূরবী' গ্রন্থের প্রথমেই মুদ্রিত রহিয়াছে।